২

শিল্প-সম্পর্কের মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার ও শিশুশ্রম

Values, Human Rights and Child Labor in Industrial Relations

শিল্প-সম্পর্ক হলো বহু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অনুশীলন। শিল্প-সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কতকগুলো মূল্যবোধ ও ধারণা কাজ করে। এগুলো জানা না থাকলে শিল্প-সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। পাশাপাশি শ্রমিক -কর্মচারীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এখন একটি বৈশ্বিক উদ্বেগ। প্রত্যেক শিল্প-সম্পর্ক ব্যবস্থাপকসহ সকল ব্যবস্থাপকদের মানবাধিকার ও সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। শিশুশ্রম মানবাধিকার লঙ্ঘন। এ বিষয়ে ধারণা থাকলে শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়ন করে সংগঠনের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়। তাই, এ সকল বিষয় এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ২.১ : শিল্প-সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ
পাঠ- ২.২ : মানবাধিকার ও শিশুশ্রম

পাঠ ২.১ শিল্প-সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ
Concept and Values of Industrial Relations

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্প-সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- শিল্প-সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ কী কী তা বলতে পারবেন;
- শিল্প-সম্পর্কের স্বচ্ছতা ও সমতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-সম্পর্কের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-সম্পর্কের স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-সম্পর্কের অধিকার ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-সম্পর্কের সততা ও আস্থা বলতে পারবেন।

শিল্প-সম্পর্ক হলো বহুপাক্ষিক এবং বহুবিষয় ভিত্তিক একটি সম্পর্ক। তাই, কোনো একক উদ্দেশ্য বা প্রেক্ষাপট দিয়ে শিল্প-সম্পর্ক অনুধাবন করা যায় না। শিল্প-সম্পর্কের পক্ষগুলোর উপলব্ধি, মনোভাব ও আচরণ বহুলাংশে তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। মালিক বা শ্রমিক, মালিক সমিতি বা শ্রমিকসংঘ তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি ও গৃহীত উদ্দেশ্যাবলির ভিত্তিতে কাজ করে। সে কারণে তাদের ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড বিশ্বাস ও মূল্যবোধ চালিত বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা চালিত হয়। তাই, শিল্প-সম্পর্কের ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, স্বচ্ছতা-সমতা কতকগুলো ধারণা ও নৈতিক নীতি ও বিশ্বাস দিয়ে বিচার করা হয় (হাইম্যান ও ব্রফ, ১৯৭৫)। এখানে বাস্তবতার বহুমুখী উপলব্ধি, মূল্যবোধ, ধারণা ও শিল্প-সম্পর্কের ভালো-মন্দের নানা মতাদর্শ ব্যবহার করা হয় (একারস, ১৯৯৪)। সমস্যা হলো এ সকল ধারণা ও মূল্যবোধের কোনো সর্বজনীন ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য নেই। ব্যক্তি ও সামাজিক অবস্থা ভেদে এদের স্বরূপ এক এক রকম হয়। এ জন্য শিল্প-সম্পর্কের সঙ্গে এই বিচিত্র ধারণাগত ও নীতি-বিশ্বাস জড়িত থাকার কারণে এখানে নমনীয় মানসিক টানাপোড়েন থাকে। যাহোক, এই অবস্থার স্বরূপ জানার জন্য শিল্প-সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত ধারণা ও মূল্যবোধগুলো সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান থাকা দরকার। এই পাঠে সালামন (২০০০: ৭৪-৮৯) প্রদত্ত শিল্প-সম্পর্কের পাঁচটি ধারণা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করা হলো। প্রথমে স্বচ্ছতা ও সমতা মূল্যবোধ দিয়ে শুরু করব।

শিল্প-সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধসমূহ

১। স্বচ্ছতা ও সমতা
২। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
৩। স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ
৪। অধিকার ও দায়িত্ব
৫। সততা ও আস্থা

স্বচ্ছতা ও সমতা
Fairness and Equity

শিল্প-সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মূল্যবোধ হলো স্বচ্ছতা ও সমতা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে ও আইন বা বিধি অনুসারে বিচার করার নাম হলো স্বচ্ছতা। অর্থাৎ, বিচার্য উপাদানগুলো কোনো রকম পক্ষপাত না করে বিচারবিবেচনা করা হলো স্বচ্ছতা। নিরপেক্ষ বিচারের অবস্থানই হলো স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত আছে

সমতা। অর্থাৎ, কোনো কাজ স্বচ্ছ হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতা ভিত্তিক হবে। কেননা, সমতা বলতে কোনো কাজের স্বচ্ছতা বা ন্যায্যতার গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। স্বচ্ছতা ও সমতার এই ধারণা সমগ্র শিল্প-সম্পর্কের ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে। শিল্প-সম্পর্কের যে কোনো সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম বৈধতা বা যৌক্তিকতা পাবে যদি কোনো এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের স্বচ্ছতা ও সমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকে ও এর প্রতি অঙ্গীকার থাকে।

সমতা ধারণাটি নিয়ে অনেকের মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। এটি মনে করার কোনো কারণ নেই যে, সমতা মানে সমান সমান এবং কোনো রকম অসমতা হলেই তা অসচ্ছ হবে। অসমতা প্রাকৃতিকভাবেই বিদ্যমান। দু'টি মানুষের মধ্যে গুণগত অসমতা থাকে; দু'টি অবস্থার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত অসমতা থাকে; সমাজে, পরিবারে বা গোত্রে সম্পদগত অসমতা থাকে, নৃতাত্ত্বিক কাঠামোতে মানুষে মানুষে অসমতা থাকে, সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সক্ষমতায় অসমতা থাকে, সংগঠনে পদগত ক্ষমতার মধ্যে অসমতা থাকে। সুতরাং সাম্য সংগঠনে ও ব্যক্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মেই অসমতা থাকে। তাই, অসমতা অন্যায় নয়, বরং স্বাভাবিক। এখানে সাম্য অর্থেই সমতা বোঝানো হয়েছে। যোগ্যতা, গুণ, ক্ষমতার পরিমাণ ইত্যাদি বিচারে আনুপাতিক সমতা বজায় রাখা হলো সাম্য। সে কারণে সমতা হলো স্বচ্ছতার একটা মাপকাঠি।

উয়িগ (১৯৫২) মন্তব্য করেন, স্বচ্ছতার ধারণাটি সর্বোত্তম রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক বিধির সাথে জোরালোভাবে সম্পর্কিত। এখানে প্রশ্ন থাকে 'সর্বোত্তম' কীভাবে শনাক্ত করা হবে। এটি আমাদেরকে উপযোগবাদ বা গণতান্ত্রিক ধারণার দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, যা অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তা হবে সর্বোত্তম এবং তা হবে স্বচ্ছ। এ কারণে ভিন্ন মূল্যবোধ ও প্রত্যাশা সম্পন্ন স্বল্পসংখ্যক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও তা সর্বোত্তম বা স্বচ্ছ হতে পারে।

অনেক সময় নৈর্ব্যক্তিক বিচার অবস্থাকে স্বচ্ছ বলা হয়। যেমনঃ বাজার প্রক্রিয়া, স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কার্য বা দ্রব্য মূল্যায়ন ইত্যাদি যা ব্যক্তিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করে। কিন্তু এটিও স্বচ্ছ নয়। কেননা, বাজার অবস্থার নানা উপাদানকে নানা মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিক অগ্রাধিকার কাজ করে। আবার স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক মূল্যায়নে নিয়ামক মানদন্ডগুলো ও তাদের আনুপাতিক গুরুত্ব ব্যক্তিক আত্মসুখের বিচারে নির্ধারণ করে স্থাপন করা হয়। এখানে নির্ধারিত স্বয়ংক্রিয় অবস্থা বিরাজ করে। আইনের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিক মূল্যবোধ ও স্বচ্ছতার আলোকে আইন প্রণয়ন, ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন করা হয়। তাই, নৈর্ব্যক্তিক যান্ত্রিক স্বচ্ছতা বলে কোনো স্বচ্ছতা নেই।

এ কারণে মানুষের আচরণ ও কর্মকাণ্ড বিচারে ব্যবহৃত স্বচ্ছতা ও সমতার ধারণা আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। এটি চিরস্থায়ী অনড় কোনো মানদণ্ড নয়। অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে এগুলো পরিবর্তিত হয়। একইভাবে ব্যক্তি মানুষের স্বচ্ছতা ও সমতার ধারণাও কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। যাহোক, স্বচ্ছতা ও সমতার ধারণা নিচের তিন উপায়ে ব্যবহার করা যায় (সালামন, ২০০০):

[১] **স্বচ্ছতার প্রথম প্রায়োগিক অর্থ হলো:** কোনো বিনিময় স্বচ্ছ হবে, যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মধ্যে যুক্তিসংগত ভারসাম্য বা দেওয়া-নেওয়ার বিষয় থাকে (হেম্যান ও ব্রাফ, ১৯৭৫)। অর্থাৎ স্বচ্ছতার একটি পূর্বশর্ত হলো পক্ষগণের পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করার মতো ভারসাম্যমূলক বিষয়বস্তু থাকতে হবে। তবে, বিনিময়ের ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়া বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা কঠিন। কেননা, এগুলো কি ফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে; নাকি যে প্রক্রিয়ায় ফল পাওয়া গেছে তার মানের উপর নির্ধারিত হবে? এ বিষয়টি চূড়ান্তভাবে পক্ষগণের মূল্যবোধ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি স্বচ্ছ হবে, যদি অংশগ্রহণকারী পক্ষগণ এটিকে স্বচ্ছ বলে ধরে নেয়।

[২] **স্বচ্ছতার দ্বিতীয় প্রায়োগিক অর্থ হলো:** কোনো বিনিময় স্বচ্ছ হবে, যদি অন্যত্র সংঘটিত একই রকম বিনিময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিনিময়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অর্থাৎ স্বচ্ছতার একটি শর্ত হলো একই রকম অন্যান্য বিনিময়ের সঙ্গে সমরূপতা। এক্ষেত্রে দু'টি বিনিময়ের মধ্যে সমতা ও পার্থক্য করার গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড সম্পর্কে ঐকমত্য থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি বিনিময় তখনই স্বচ্ছ হবে, যখন সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বাইরে অন্য পক্ষগণ বিনিময়টি তাদের বিবেচনায় স্বচ্ছ মনে করবে।

[২] **স্বচ্ছতার তৃতীয় প্রায়োগিক অর্থ হলো:** কোনো বিনিময় স্বচ্ছ হবে, যদি দীর্ঘকাল একই সম্পর্কের মধ্যে বা অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই রকম আচরণ ও বিবেচনা জারি থাকে। কাল অতিক্রান্ত হলেও আচরণ ও বিবেচনার সমতা বজায় থাকাটা স্বচ্ছতা বুঝায়। স্বচ্ছতার ধারণায় এটি প্রত্যাশিত যে, একরকম মানদণ্ড ও বিচারের আদর্শ একরকম অবস্থায় বারবার ব্যবহার করে সম্পর্ক বজায় রাখা হবে এবং সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য এই মানদণ্ড দিয়ে সম্পর্ক বিচার করা হবে। তা হলে বলা যায়, স্বচ্ছতা হবে যদি কালে কালে একই আচরণ ও বিবেচনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বচ্ছতা একটা তুলনামূলক পরিবর্তনশীল ধারণা। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে পক্ষগণের স্বচ্ছতার ধারণাও পরিবর্তিত হয়।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

Power and Authority

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এই দুটি ধারণা শিল্প-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অবস্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে শিল্প-সম্পর্কের যৌথ কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। অন্যকে প্রভাবিত করা বা শাসন করার প্রধান শক্তি হচ্ছে ক্ষমতা। মানুষ ব্যবস্থাপনা বা শ্রমিকসংঘের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের ভিত্তিতে তাদের মূল্য বিচার করে। তারা 'শ্রমিকসংঘের বেশি ক্ষমতা নেই', 'শ্রমিকসংঘের প্রবল ক্ষমতা আছে', 'ব্যবস্থাপনার কর্মচারীদের উপর অত্যধিক কর্তৃত্ব আছে' ইত্যাদি বাগধারায় মন্তব্য করে থাকে। যদিও ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দুইটি আলাদা অথচ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পর্কিত ভাব প্রকাশক শব্দ, তবে বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অদলবদল করে ব্যবহার হয়ে থাকে। যাহোক, আমরা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অর্থ ও শিল্প-সম্পর্কে এদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব।

ক্ষমতা (Power)

ক্ষমতা শব্দটির নানা ধারণা ও দিক রয়েছে। ক্ষমতা বলতে সাধারণভাবে শক্তিকে বোঝায়। এই শক্তি গাত্র শক্তি, সামাজিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি ইত্যাদি নানা শক্তি বা ক্ষমতা হতে পারে। মিঞ্জবার্গ (১৯৮৩:৪-৫) এবং ফিফার (১৯৮১:২-৪) ক্ষমতা বলতে অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করার সক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন [Power is the capacity to affect the behavior of others.] আইরিচ ও কুঞ্জ (২০০৬:২২৫) ক্ষমতার সংজ্ঞায় বলেন, ক্ষমতা হলো ব্যক্তির বা দলের অন্য ব্যক্তি বা দলের বিশ্বাস বা কার্যক্রমকে অনুপ্রাণিত করা বা প্রভাবিত করার সামর্থ্য। [Power is the ability of individuals or groups to induce or influence the belief or actions of other persons or groups.] অন্য দিকে, হাইম্যান (১৯৭৫:২৬) বলেন, ক্ষমতা হলো নিজের বা নিজেদের ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা এবং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, অন্যদের গৃহীত বা গৃহীত হয় নাই এমন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। [Power is the ability of an individual or group to control his (their) physical and social environment; and as part of the process, the ability to influence the decisions which are or are not taken by others.] ম্যাগিন্যু ও প্রিট (১৯৭৬:১৯৭) বলেন, ক্ষমতা হলো অন্য পক্ষের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা বা ছাড় পাবার জন্য তাকে বাধ্য করার সক্ষমতা। [Power is the capacity to elicit concessions from the other party.] এখানে নানা আঙ্গিকে ক্ষমতার ধারণা দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতার সব ক'টি ধারণার অবস্থা বিবেচনায় গ্রহণযোগ্যতা আছে।

এ প্রেক্ষাপটে শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্যতার বিচারে ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে:

১। ক্ষমতা হচ্ছে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বা তার উপর কোনো অবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা।

২। ক্ষমতা হচ্ছে কোনো পক্ষের সিদ্ধান্ত বা কর্মকাণ্ড সংশোধন করার জন্য তাকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য বা সক্ষমতা। এই প্রভাব হুমকির মতো প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য উভয় পন্থায় হতে পারে।

৩। ক্ষমতা হচ্ছে সামষ্টিক স্বার্থ অর্জনের জন্য অন্যের উপর ক্রিয়াশীল একটা বাধ্যকরণ সম্পদ।

৪। ক্ষমতা হলো সম্পদ ব্যবহার করে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য বা সক্ষমতা।

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে হাইম্যান (১৯৭৫) মন্তব্য করেন, অর্ন্তনিহিত অর্থে নিয়োগ সম্পর্ক হলো ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের সম্পর্ক। আমরা জানি, শিল্প-সম্পর্ক হলো নিয়োগ সম্পর্ক। এ প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাকে শিল্প-সম্পর্কের চালিকা শক্তি বলা যায়। এবার আমরা দেখব সাংগঠনিক সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার উৎসগুলো কী কী।

ক্ষমতার উৎস (Sources of Power)

ফ্রেঞ্চ ও রেভেন (১৯৫৯) পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পাঁচটি ক্ষমতার উৎস নির্দেশ করেছেন। সেগুলো হলো:

ক) পুরস্কারের ক্ষমতা (Reward Power): অন্যের প্রত্যাশিত লক্ষ্য বা সুবিধা অর্জনকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার সামর্থ্য হলো পুরস্কারের ক্ষমতা। এটি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোনো কিছু দেওয়া বা না দেওয়ার সক্ষমতা বা অধিকার।

খ) বলপ্রয়োগের ক্ষমতা (Coercive Power): অন্যের উপর বেদনাদায়ক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তাকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য হলো বল প্রয়োগের ক্ষমতা। এটি অন্য পক্ষকে কোনো কিছু করা বা না করার জন্য নির্যাতন-নিপীড়নের ভয়ভীতি দেখিয়ে বাধ্য করার সক্ষমতা।

গ) বৈধ ক্ষমতা (Legitimised Power): অন্যকে পরিচালিত করার বা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত আনুষ্ঠানিক পদাধিকার বা ভূমিকাধারী সক্ষমতা হলো বৈধ ক্ষমতা।

ঘ) ব্যক্তিগত ক্ষমতা (Referment Power): অন্যকে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বাস্তবায়ন বিলম্বিত করা বা মতকে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বিরত রাখতে নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটানোর সামর্থ্য হলো ব্যক্তিগত ক্ষমতা।

ঙ) বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা (Expertise Power): উচ্চতর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণে অন্যকে প্রভাবিত করা বা অন্যদের মান্যতা অর্জন করার সামর্থ্য হলো বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা।

তবে, মরগ্যান (১৯৯৭:১৭০-৯৮) মনে করেন, সাংগঠনিক জীবনের গতিময়তার উপর ক্ষমতার বিস্তৃতি, প্রদর্শন, ব্যাপকতা ও সাফল্য নির্ভর করে। তার মত অনুসারে ক্ষমতা আছে কিনা তা নিম্নবর্ণিত সক্ষমতা থেকে বোঝা যাবে:

- সাংগঠনিক সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সিস্টেমসের উপর নিয়ন্ত্রণ;
- বিষয়ভিত্তিক ও বহুমুখী জ্ঞান ও তথ্য অর্জন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ;
- সাংগঠনিক কাঠামো, বিধি ও প্রবিধানের জুতসই ব্যবহার; এবং
- জোটভুক্ত পক্ষগণ, নেটওয়ার্ক, অনানুষ্ঠানিক সংগঠন ও পাল্টা সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ।

মনে রাখা দরকার যে, ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় যদি পক্ষগণের মধ্যে ক্ষমতার পারস্পরিক উপলব্ধি থাকে (ম্যাগিন্যু ও প্রিট (১৯৭৬:১৯৮)। তারা শিল্প-সম্পর্কের যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে ক্ষমতার পারস্পরিক উপলব্ধি কীভাবে কাজ করে তা দেখিয়েছেন। তারা বলেন:

- পক্ষগণের মধ্যে ক্ষমতার উপলব্ধির সমতা থাকলে তাদের মধ্যে সহজে ঐক্যমত হয় এবং উচ্চ মানের পরিণতি বা ফল অর্জিত হয়।
- পক্ষগণের মধ্যে নিম্নক্ষমতা অসমতার উপলব্ধি থাকলে ঐক্যমতে পৌছানো কঠিন হয় এবং নিম্নমানের পরিণতি বা ফল অর্জিত হয়।
- পক্ষগণের মধ্যে উচ্চক্ষমতা অসমতার উপলব্ধি থাকলে সহজে ঐক্যমত হয় এবং উচ্চ অথচ পক্ষপাতদুষ্ট মানের পরিণতি বা ফল অর্জিত হয়।

কর্তৃত্ব (Authority)

কর্তৃত্ব হলো ক্ষমতার বৈধ ব্যবহার। আইরিচ ও কুঞ্জ (২০০৬) মনে করেন, সাংগঠনিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্জনের জন্য সাংগঠনিক পদে অর্পিত ব্যতিক্রমী আচরণ করার অধিকারই হলো কর্তৃত্ব। অন্য দিকে, ফক্স (১৯৭১:৩৪) মনে করেন, কর্মচারীদের বশ্যতা বা বাধ্যতা প্রত্যাশা করা ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার হলো কর্তৃত্ব। [Authority is the right to expect and command obedience.] হাইম্যান মনে করেন, ক্ষমতা হলো মালিকের বা ব্যবস্থাপকের প্রাধিকার। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যসম্পাদন ও শ্রমিকদের আদেশ দানের জন্য স্বাভাবিকভাবে ব্যবস্থাপনা এই অধিকার বা প্রাধিকার অর্জন করে। কোনো ব্যক্তি নিয়োগচুক্তি করার মাধ্যমে নিজের কাজকে চালিত ও নিয়ন্ত্রণ করার বৈধতা মালিক বা ব্যবস্থাপককে দিয়ে দেয় এবং বশ্যতা বা বাধ্যবাধকতা বজায় রাখার জন্য মালিক নিষেধাজ্ঞা দেবে তার বৈধতাও দিয়ে দেয় (১৯৭১:৪০)। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সমাজের অবকাঠামোই ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ও ক্ষমতার বৈধতা দেয় এবং নিয়োগ-সম্পর্কের উপর ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়।

যাহোক, কর্তৃত্বের মাধ্যমে বৈধতা পাওয়া ক্ষমতার ধারণার শিল্প-সম্পর্কের উপর নিচের তিনটি বিশেষ নিহিত আছে-

ক) ক্ষমতার ব্যবহার অগ্রহণযোগ্য (বেঠিক বা মন্দ) হলেও কর্তৃত্বের ব্যবহার গ্রহণযোগ্য (সঠিক বা ভালো) হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যগণ বৈধ কর্তৃত্ব দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করবেন এবং প্রয়োজনে সামাজিক শান্তি বজায় রাখার শক্তি হিসেবে কাজ করবেন। কিন্তু কোন রকমে সমাজে অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

খ) কর্মচারী হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকা ও শ্রমিকসংঘের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকার মধ্যে সম্ভাব্য আনুগত্যের দ্বন্দ্ব আছে। মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া মানুষকে শাসক হিসেবে নিয়োজিত লোকদের আদেশ মান্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন, শ্রমিকসংঘের কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনার বিকল্প কর্তৃত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হলে সমাজে ও সংগঠনে শ্রমিকসংঘের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গ) ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলনের সাথে অধঃস্তন অধিকার নিকটতম বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। ব্যবস্থাপকদের কিছু অধঃস্তন অধিকার যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধতা পায়। আর কিছু অধঃস্তন অধিকার ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই অধিকার অধঃস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ চুক্তি ও আনুষ্ঠানিক মান্যতার কারণে উদ্ভূত হয়। এ ছাড়া, দেশের আইন, বিধিবিধান, সামাজিক রীতিনীতি ও শিষ্টাচার আরও কিছু অধঃস্তন অধিকার সৃষ্টি করে। ব্যবস্থাপকদের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও সমন্বয় কাজ কিছু অধস্তন অধিকার প্রদান করে।

পরিশেষে বলা যায়, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সামগ্রিকভাবে শিল্প-সম্পর্ক নিয়মতান্ত্রিক করায় অবদান রাখে।

এবার আলোচনা হবে স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ ধারণাটি নিয়ে।

স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ

Individualism and Collectivism

স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ শিল্প সমাজে বহুল কথিত শব্দমালা। আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে ব্যক্তির গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। ব্যক্তিকে একটি স্বতন্ত্র্য সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল ধরে নেওয়ার নীতি হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। হফস্টিড ও বন্ড (১৯৮৪) বলেন, স্বাতন্ত্র্যবাদ এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ কেবল নিজের ও নিজের নিকট আত্মীয়দের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। [Individualism is a situation in which people are concerned with themselves and close family members only]. স্বাতন্ত্র্যবাদ একটি সামাজিক মতবাদ। এই মতবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতা, অধিকার বা স্বাধিকারের কর্মের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের স্বীকৃতি দেয়। এটি একটি বিশ্বাস, নীতি বা অভ্যাস যা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম করার অধিকার স্বীকার করে, অনুমোদন করে ও উৎসাহিত করে। এ প্রেক্ষিতে চয়ার্ট (১৯৯০) মন্তব্য করেন, স্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মোপলব্ধির অধিকারের সঙ্গেই জড়িত। [Individualism involves with the right of the individual to freedom and self-realization.].

নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক, দলের একজন, উৎপাদনের একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে একজন আলাদা, স্বাধীন, নিজ গুণে গুণান্বিত ও আত্মস্বার্থমুখী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রণোদনা দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই রকম বিবেচনা করা দরকার।

সংঘবাদ একটি দলীয় চিন্তা ও দলগত স্বার্থমুখী মতবাদ। হফস্টিড ও বন্ড (১৯৮৪) বলেন, সংঘবাদ এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ নিজেকে একটা বড় দলের সদস্য মনে করে এবং তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে দল তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে বলে বিশ্বাস করে। [Collectivism is a situation in which people feel they belong to a larger group which care for them in exchange of loyalty.] সংঘবাদ দলীয় লক্ষ্য দ্বারা উজ্জীবিত হয় এবং দীর্ঘ-মেয়াদি সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়।

শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকসংঘ উভয়ের জন্য স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ কাজে লাগে। এই দু'টি ধারণার আন্তঃসম্পর্ক শিল্প-সম্পর্কের মূল চালিকা শক্তি। সালামন (২০০০:৮২) মনে করেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ শিল্প-সম্পর্কের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গঠন করে। সেগুলো হলোঃ

ক) ব্যবস্থাপনা কর্মচারীদের জন্য যা সেরা মনে করে তা করার স্বাধীনতা ভোগ করে (স্বাতন্ত্র্যবাদ)। তবে, শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবস্থাপনার সাথে সমান অধিকারে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে (সংঘবাদ)।

খ) প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারীরা ব্যক্তিক যোগ্যতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার বিচারে ভিন্নভাবে মূল্যায়িত হয় বলে একই কাজ করলেও ভিন্ন মজুরি ও উৎসাহ ভাতা পায় (স্বাতন্ত্র্যবাদ)। তবে, সকল শ্রমিক কর্মচারীই তাদের ব্যক্তিক গুণাবলি ও যোগ্যতার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই সাধারণ নিয়োগ শর্ত ও অবস্থার অধীনে নিযুক্ত হয় (সংঘবাদ)।

গ) ব্যক্তি শ্রমিক-কর্মচারী তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ দলীয় সহায়তা ছাড়া তার নিজস্ব প্রচেষ্টার ফল মনে করে (স্বাতন্ত্র্যবাদ)। আবার সেই ব্যক্তিই অন্য শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে নিজেকে একাত্ম মনে করে এবং মনে করে যে, যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া ব্যক্তিক চাহিদা পূরণ করা যায় না (সংঘবাদ)।

সার্বিক বিচারে বলা যায়, স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ মূল্যবোধ শিল্প-সম্পর্কের নানা ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকসংঘকে স্বতন্ত্র্যভাবে এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে সহায়তা করে। আধুনিক শিল্প সংগঠনে ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য ও সামষ্টিক কল্যাণ উভয়ই বজায় রাখা হয় এবং সমন্বিত, সমন্বয়কৃত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মাধ্যমে শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।

এবার আলোচনা হবে অধিকার ও দায়িত্ব ধারণাটি নিয়ে।

অধিকার ও দায়িত্ব

Rights and Responsibilities

অধিকার এর আভিধানিক অর্থ হলো ন্যায্য বা আইনানুগ দাবি অথবা আইন, ঐতিহ্য বা প্রাকৃতিক কারণে কারো প্রাপ্যতাকে বোঝায়। ধারণাগতভাবে অধিকার দু'টি অর্থ প্রকাশ করে। প্রথমতঃ অধিকার হলো মৌলিক ও সর্বজনীন প্রাপ্য বা দাবি যা সকলের জন্য প্রযোজ্য। যেমন- বাক স্বাধীনতার অধিকার। তবে, এটি অন্যের স্বাধীনতা দ্বারা সীমিত। দ্বিতীয়তঃ অধিকার হলো বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ যা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন- ব্যবস্থাপনায় প্রাধিকার বা ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার। কোনো ব্যক্তি বা দল উত্তরাধিকার বা আনুষ্ঠানিক পদাধিকার থাকার কারণে যে অনন্য বা বিশেষ সুবিধা পায় তা হলো প্রাধিকার বা বিশেষাধিকার। ব্যবস্থাপনায় প্রাধিকার বলতে স্টরে (১৯৮৩:১০২) বলেন, এটি এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় যা নির্ধারণের জন্য ব্যবস্থাপনার একক ও অনন্য অধিকার আছে বলে ব্যবস্থাপনা মনে করে। এছাড়া, আইনগতভাবে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের কতিপয় বিষয়ে অধিকার আছে। শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অধিকার নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

দায়িত্ব বলতে কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা বা কোনো কাজ করার দায় বা কোনো কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। দায়িত্ব বলতে কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করা বা নিয়ন্ত্রণ করাকে বুঝায়। আবার দায়িত্ব বলতে কোন ব্যক্তি বা দলের কোন কাজ করার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একক ও অনন্য স্বাধীনতা বা বিশেষ সুবিধা বুঝায়। দায়িত্ব ব্যক্তির

মনন থেকে আসতে পারে, আবার বাইরের আইনকানুন, বিধিবিধান, সামাজিক রীতিনীতি থেকে আসতে পারে। যেভাবেই আসুক না কেন, দায়িত্ব কোনো কিছু করা বা না করার দায় বা বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।

অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে কিছু পারস্পার্য সম্পর্ক আছে। সেগুলো হচ্ছে: [১] অধিকারের সাথে সমান ও বিপরীত দায়িত্ব জড়িত থাকে; [২] অধিকার কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হলে কোনো এক পক্ষের দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক; [৩] দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সাথে অন্য এক পক্ষের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সংশ্লিষ্ট থাকে; [৪] কোন বিশেষ বিশ্বাস ও ধারণার সমর্থনে প্রামাণিক সূত্র হিসেবে অধিকার ও দায়িত্ব কাজ করে। যাহোক, শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মালিক বা ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পাদন জড়িত।

সর্বশেষ আলোচনা হবে সততা ও আস্থা মূল্যবোধটি নিয়ে।

সততা ও আস্থা

Integrity and Trust

শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সততা ও পারস্পরিক আস্থা জরুরি। শিল্প-সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে সততা ও আস্থা মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সততা হচ্ছে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অনুসারে ব্যক্তির কার্যসম্পাদন। আভিধানিক অর্থে সততা হলো সত্যনিষ্ঠ বা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার গুণ অথবা শক্তিশালী নৈতিক মান ধারণ। সততা একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা। সততার অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য হলো অন্য লোকেরা যেন ব্যক্তির মুখের কথা ও কাজের মধ্যে একটা মিল দেখতে পায় ও একই মূল্যবোধের প্রকাশ যেন থাকে। শিল্প-সম্পর্কের অন্যতম নীতিগত বিষয় হলো ব্যবস্থাপনা বা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সততা বজায় রাখা। অন্যদিকে, আস্থা হলো অন্যের উপর বিশ্বাস করা বা ভরসা করা। আভিধানিক অর্থে আস্থা হচ্ছে অপর কোনো ব্যক্তির ভালোত্ব, সামর্থ্য, যোগ্যতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করা যায় বলে বিশ্বাস করা। এ জন্য আস্থা দুটি মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে। দুটি দলের মধ্যে আস্থা হয় না। আমরা যখন বলি ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকসংঘের মধ্যে আস্থা বা আন্তঃসংগঠন আস্থা, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তা দু'জন শীর্ষ মানুষের মধ্যে আস্থাকে প্রকাশ করে। আন্তঃব্যক্তিক আস্থা বিদ্যমান থাকে যখন কোনো ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির উপর বিশ্বাস থাকে, তার উপর নির্ভর করা যায় বলে মনে করে, বা কোনভাবেই একে অন্যের ক্ষতি করতে চায় না। নিয়োগ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফক্স (১৯৭৪) দুই ধরনের আস্থাভিত্তিক নিয়োগ সম্পর্কের কথা বলেছেন- একটি হলো উচ্চ আস্থার নিয়োগ সম্পর্ক, অন্যটি হলো নিম্ন আস্থার নিয়োগ সম্পর্ক। উচ্চ আস্থার নিয়োগ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীরা তাদের সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে অনানুষ্ঠানিক দেওয়া-নেওয়াকে গ্রহণ করে। আর নিম্ন আস্থার নিয়োগ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের সম্পর্কের মধ্যে অধিকতর আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্থা ব্যক্তিদের একে অন্যের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও খোলামেলা হওয়ার কথা বলে না। কেননা, এখানে ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকায় প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করতে চায়। সে কারণে পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত ও খোলামেলা হওয়া যায় না। এ প্রেক্ষিতে সালামন (২০০০:৮৯) এর মতে শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্থা দাবি করে যে, ব্যক্তি নিজের কথা ও চুক্তি রক্ষা করবে; নির্ভরশীলতা বজায় রাখবে; তথ্য গোপনে প্রকাশ করবে না; তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো ব্যক্তির অবস্থা বা তার সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইবে না এবং সর্বোপরি অন্যের ভূমিকা ও উদ্দেশ্যের বৈধতা গ্রহণ করবে। আস্থার ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আস্থা গড়ে তোলা কঠিন কিন্তু নষ্ট করা সহজ। তাই, এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

শিল্প-সম্পর্ক বহুপাক্ষিক এবং বহুবিষয় ভিত্তিক একটি সম্পর্ক। শিল্প-সম্পর্কের পক্ষগুলোর উপলব্ধি, মনোভাব, ও আচরণ বহুলাংশে তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। শিল্প-সম্পর্কের ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, স্বচ্ছতা-সমতা কতকগুলো ধারণা ও নৈতিক নীতি ও বিশ্বাস দিয়ে বিচার করা হয়। এখানে বাস্তবতার বহুমুখী উপলব্ধি, মূল্যবোধ, ধারণা ও শিল্প-সম্পর্কের ভালো-মন্দের নানা মতাদর্শ ব্যবহার করা হয়। সালামন প্রদত্ত শিল্প-সম্পর্কের পাঁচটি ধারণা ও মূল্যবোধ হলো: স্বচ্ছতা ও সমতা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ, অধিকার ও দায়িত্ব এবং সততা ও আস্থা। এগুলো নিয়ে এই পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শিল্প-সম্পর্ক ভালো রাখতে হলে এই ধারণা ও মূল্যবোধ অনুধাবন ও ব্যবহার করা দরকার।

পাঠ ২.২ মানবাধিকার ও শিশুশ্রম
Human Rights and Child Labour

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অধিকার বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- মানবাধিকার বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- শিশুশ্রম বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- শিশুশ্রম নিষিদ্ধ কি না তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে শিশুশ্রমের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিল্প-সম্পর্ক হলো বহুপাক্ষিক এবং বহুবিষয় ভিত্তিক একটি সম্পর্ক। তাই, কোনো একক উদ্দেশ্য বা প্রেক্ষাপট দিয়ে শিল্প-সম্পর্ক অনুধাবন করা যায় না। শিল্প-সম্পর্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে মানবাধিকার। পাশাপাশি আর একটি বিষয় হলো শিশুশ্রম। বিশ্বব্যাপী অসংখ্য শিশু শ্রমিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করে; যদিও শিশুশ্রম জাতিসংঘ কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সকল দেশেও তা নিষিদ্ধ। এ প্রেক্ষিতে মানবাধিকার ও শিশুশ্রম নিয়ে এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে শুরু করব অধিকার ধারণাটি দিয়ে।

অধিকার
Rights

অধিকার হলো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি যার নৈতিক বা আইনগত ভিত্তি আছে এবং যা সমাজে তার বা তাদের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। অধিকারের অন্য একটি ধারণা হলো অধিকার আইনগতভাবে সৃষ্টি হয় না; এটি মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভব হয়। অধিকার নৈতিক ও আইনগত এই দুই ধরনের হয়। এবার বিষয় হলো মানবাধিকার।

মানবাধিকার
Human Rights

মানবাধিকার হলো নৈতিক নীতি বা নিয়মাচার (নিকেল ও অন্যান্য, ২০১৩) যা কতকগুলো আদর্শ মানব আচরণ বর্ণনা করে এবং যা প্রাকৃতিক ও আইনগত অধিকার হিসেবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে সুরক্ষিত থাকে। মানবাধিকার এমন একটি অধিকার যা প্রতিটি মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার কারণে নৈতিক ও আইনগতভাবে দাবি করতে পারে। এই অধিকার মানুষ জন্মসূত্রে পায় এবং এটি তার অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মানবাধিকার মানুষের নরগোষ্ঠী, রং, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, জাতিসত্তা, ভৌগলিক অবস্থান বা অন্য কোনো মত বা অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। এই অধিকার ব্যক্তি মানুষের সহজাত অধিকার; যা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানবাধিকার সকল স্থানে, সকল সময়ে এবং সকলের জন্য প্রযোজ্য। মানবাধিকার হলো স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা; যা বিশ্বের সকল মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভোগ করে।

মৌলিক অধিকার

Fundamental Rights

মৌলিক অধিকার একটি কৌশলগত পরিভাষা। এটি এমন সব মানবাধিকারকে বুঝায় যা সংবিধানে লিখিত আছে ও সাংবিধানিক নিশ্চয়তার মাধ্যমে সুরক্ষিত। এটি এই কারণে মৌলিক অধিকার যে, এই অধিকারগুলো দেশের সর্বোচ্চ মৌলিক আইন এবং দেশের অন্য সকল আইনের উপরে এর অবস্থান। দেশের কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, বা ব্যক্তি এমন কোনো আইন বা বিধান প্রবর্তন করতে পারে না যা এই মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান অনুমোদন করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের মাত্র ১১ মাসের মধ্যে জাতির জনক ১৮টি মৌলিক অধিকার সম্বলিত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান উপহার দেন। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল একটা উদাহরণ। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য ১৮টি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলো মৌলিক মানবাধিকার। আমরা এখন এই মৌলিক মানবাধিকারগুলো জানব।

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার

Fundamental Rights of Constitution of Bangladesh

তৃতীয়ভাগ: মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল

অনুচ্ছেদ: ২৬।

(১) এই ভাগের বিধানাবলির সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোনো আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

আইনের দৃষ্টিতে সমতা

অনুচ্ছেদ: ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

অনুচ্ছেদ: ২৮।

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা

অনুচ্ছেদ: ২৯।

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সমপ্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সমপ্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যেকোনো আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে, রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

বিদেশি খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ

অনুচ্ছেদ: ৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনো উপাধি, খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।

আইনের আশ্রয়-লাভেরঅধিকার

অনুচ্ছেদ: ৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকাররক্ষণ

অনুচ্ছেদ: ৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

অনুচ্ছেদ: ৩৩।

(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোনো কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশি শত্রু, অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয়মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীমকোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোনো উপদেষ্টা-পর্ষদ উক্ত ছয়মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্তকারণ রহিয়াছে।

(৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগ দান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

অনুচ্ছেদ: ৩৪।

(১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনোভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনত: দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনত দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা (খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ

অনুচ্ছেদ: ৩৫।

(১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্য সংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইন বলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোনো বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোনো কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

চলাফেরার স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ: ৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সমাবেশের স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ: ৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সংগঠনের স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ:

৩৮। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ: ৩৯।

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে-

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ: ৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি- গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোনো যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যেকোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ: ৪১।

(১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

সম্পত্তির অধিকার

অনুচ্ছেদ: ৪২।

(১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

অনুচ্ছেদ: ৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

অনুচ্ছেদ: ৪৪।

(১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

শৃঙ্খলামূলক আইন

অনুচ্ছেদ: ৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোনো শৃঙ্খলামূলক আইনের যেকোনো বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্য পালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা

অনুচ্ছেদ: ৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যেকোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোনো কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

কতিপয় আইনের হেফাজত

অনুচ্ছেদ: ৪৭।

(১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এইভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না:

(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;

(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজতৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকারবিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা

(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।

(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্রবাহিনী বা প্রতিরক্ষাবাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি বা সংগঠন কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা

অনুচ্ছেদ: ৪৭ ক।

(১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোনো প্রতিকারের জন্য সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করিবার কোনো অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।

এবার আমরা পৃথিবীর সব দেশের জন্য পালনীয় সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার বর্ণনা করব।

সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার

Universal Fundamental Human Rights

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১০ অক্টোবর, ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। এই ঘোষণায় ৩০টি ধারা রয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের সকলেই ন্যুনপক্ষে একটি ধারা অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশ এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী একটা দেশ। শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য একটা পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে ব্যবসায় প্রশাসনের সকল শিক্ষার্থীকে এই সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে জানা দরকার। এ লক্ষ্যে এই ঘোষণার মুখবন্ধসহ ধারাসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

মুখবন্ধ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তি;

যেহেতু মানব অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার ফলে মানুষের বিবেক লাঞ্ছিত বোধ করে এমন সব বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যেহেতু এমন একটি পৃথিবীর উদ্ভবকে সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষারূপে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে সকল মানুষ ধর্ম এবং বাকস্বাধীনতা ভোগ করবে এবং অভাব ও শংকামুক্ত জীবনযাপন করবে;

যেহেতু মানুষ যাতে অত্যাচার ও উৎপীড়নের মুখে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হয় সেজন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি প্রয়োজনীয়;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক;

যেহেতু সদস্য জাতিসমূহ জাতিসংঘের সনদে মৌলিক মানবাধিকার, মানব দেহের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং বৃহত্তর স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে সামাজিক উন্নতি এবং জীবনযাত্রার উন্নততর মান অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন;

যেহেতু সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের প্রতি সর্বজনীন সম্মান বৃদ্ধি এবং এদের যথাযথ পালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ;

যেহেতু এ স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহের একটি সাধারণ উপলব্ধি এ অঙ্গীকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এজন্য এখন সাধারণ পরিষদ এই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করছে।

এ ঘোষণা সকল জাতি এবং রাষ্ট্রের সাফল্যের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে সেই লক্ষ্যে নিবেদিত হবে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতিটি অঙ্গ এ ঘোষণাকে সবসময় মনে রেখে পাঠদান ও শিক্ষার মাধ্যমে এই স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের জাতিসমূহ উত্তরোত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে এই অধিকার এবং স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি আদায় এবং যথাযথ পালন নিশ্চিত করবে।

ধারা ১

সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

ধারা ২

এ ঘোষণায় উল্লিখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে। কোনো দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোনো অধিবাসীর প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য করা হবে না; সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীনই হোক, হোক অছিভুক্ত, অস্বায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

ধারা ৩

জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।

ধারা ৪

কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা এবং দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে।

ধারা ৫

কাউকে নির্যাতন করা যাবে না; কিংবা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না অথবা কাউকে এহেন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

ধারা ৬

আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।

ধারা ৭

আইনের চোখে সবাই সমান এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলেই আইনের আশ্রয় সমানভাবে ভোগ করবে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করে এমন কোনো বৈষম্য বা বৈষম্য সৃষ্টির প্ররোচনার মুখে সমানভাবে আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ৮

শাসনতন্ত্রে বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ৯

কাউকেই খেয়াল খুশিমতো গ্রেপ্তার বা অন্তরীণ করা কিংবা নির্বাসন দেওয়া যাবে না।

ধারা ১০

নিজের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের জন্য প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার রয়েছে।

ধারা ১১

১. দন্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চিত অধিকারসম্বলিত একটি প্রকাশ্য আদালতে আইনানুসারে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার অধিকার থাকবে।

২. কাউকেই এমন কোনো কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ বা ত্রুটি সংঘটনের সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল না। দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনের সময় যে শাস্তি প্রযোজ্য ছিল, তার চেয়ে গুরুতর শাস্তিও দেওয়া চলবে না।

ধারা ১২

কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কিংবা তাঁর গৃহ, পরিবার ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল খুশিমতো হস্তক্ষেপ কিংবা তাঁর সুনাম ও সম্মানের উপর আঘাত করা চলবে না। এ ধরনের হস্তক্ষেপ বা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

ধারা ১৩

১. নিজ রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোনো দেশ পরিত্যাগ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

ধারা ১৪

১. নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভিন্নদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করবার এবং সে দেশের আশ্রয়ে থাকবার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. অরাজনৈতিক অপরাধ এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য এবং মূলনীতির পরিপন্থী কাজ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত অভিযোগের ক্ষেত্রে এ অধিকার প্রার্থনা নাও করা যেতে পারে।

ধারা ১৫

১. প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, কিংবা কারো জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবে না।

ধারা ১৬

১. ধর্ম, গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে সকল পূর্ণবয়স্ক নরনারীর বিয়ে করা এবং পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। বিয়ে, দাম্পত্য জীবন এবং বিবাহবিচ্ছেদে তাদের সমান অধিকার থাকবে।

২. বিয়েতে ইচ্ছুক নরনারীর স্বাধীন এবং পূর্ণসম্মতিতেই কেবল বিয়ে সম্পন্ন হবে।

৩. পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক এবং মৌলিক গোষ্ঠী- একক, সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার পরিবারের রয়েছে।

ধারা ১৭

১. প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে।

২. কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা ১৮

প্রত্যেকেরই ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের সঙ্গে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার এবং এইসঙ্গে, প্রকাশ্যে বা একান্তে, একা বা অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে, শিক্ষাদান, অনুশীলন, উপাসনা বা আচারব্রত পালনের মাধ্যমে ধর্ম বা বিশ্বাস ব্যক্ত করার অধিকারও অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

ধারা ১৯

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যেকোনো মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২০

১. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে।

২. কাউকে কোনো সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা ২১

১. প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

৩. জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোনো অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকেরই আপন মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৩

১. প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকুরি বেছে নেবার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।

২. কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

৩. কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনবোধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

৪. নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

ধারা ২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে; নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতনসহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

ধারা ২৫

১. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদির সুযোগ এবং এসঙ্গে পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্য কারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

২. মাতৃত্ব এবং শৈশবাবস্থায় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার আছে। বিবাহবন্ধন-বহির্ভূত কিংবা বিবাহবন্ধনজাত সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

ধারা ২৬

১. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

২. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা-সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গোত্র এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস পাবে এবং শান্তি রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের কার্যাবলিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩. কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া হবে, তা বেছে নেবার পূর্বাধিকার পিতামাতার থাকবে।

ধারা ২৭

১. প্রত্যেকেরই সমষ্টিগত সংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহে অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলাভিত্তিক কোনো কর্মের রচয়িতা হিসেবে নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসংরক্ষণের অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে।

ধারা ২৮

এ ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব এমন একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অংশীদারিত্বের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ধারা ২৯

১. প্রত্যেকেরই সে সমাজের প্রতি পালনীয় কর্তব্য রয়েছে, যে সমাজেই কেবল তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের স্বাধীন এবং পূর্ণবিকাশ সম্ভব।

২. আপন স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহ ভোগ করার সময় প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন যা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায়ানুগ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আইন দ্বারা নির্নীত হবে।

৩. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পরিপন্থী কোন উপায়ে এ অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করা যাবে না।

ধারা ৩০

কোনো রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এ ঘোষণাপত্রের কোনো কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, যার বলে তারা এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ নস্যাৎ করতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতে পারেন কিংবা সে ধরনের কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

আসুন এখন জেনে নেই শিশুশ্রম সম্পর্কে।

শিশুশ্রম
Child Labour

শিশু কে?

বাংলাদেশে শিশু বলতে বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৪ অনুসারে বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে , অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হইবে। এই আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, যেহেতু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হয়েছে, সে কারণে বিদ্যমান শিশু আইন রহিত করা প্রয়োজন বিধায় এই আইন প্রণয়ন করা হলো। জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশনে বলা হয়েছে যে, ১৮ বছরের নিচে সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এর ধারা ১(৬৩)-তে ছিল শিশু অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি। কিন্তু এই শিশু আইন ২০১৩ প্রবর্তনের ফলে এখন থেকে শিশু বলতে ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি এমন সকল ব্যক্তিকে বোঝাবে।

শিশুশ্রম কী?

শিশুশ্রম বলতে এমন সব কাজকে বোঝায় যা শিশুদের শিশুকাল বঞ্চিত করে; তাদের সম্ভাবনা বা তাদের মর্যাদা হরণ করে; এবং যা শিশুদের মানসিক ও দৈহিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর। অর্থাৎ এমন সব কাজ যা শিশুদের জন্য মানসিক, দৈহিক, সামাজিক বা নৈতিক বিচারে মারাত্মক ও ক্ষতিকর এবং যা শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার ঘোষণায় মানুষের মৌলিক মানব অধিকার এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আপন মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম

শিশুদের মৌলিক মানব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং শিশুদের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে বিধায় শিশুশ্রম সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এর ধারা ৩৪ (১) এ বলা হয়েছে, কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাইবে না বা কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না। এই আইনের ধারা-৩৫ এ বলা হয়েছে, কোন শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক শিশুকে কোন কাজে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিয়া কাহারও সহিত কোন চুক্তি করিতে পারিবেন না। আর বাংলাদেশে প্রযোজ্য চুক্তি আইন ১৮৭২ অনুসারে কোনো শিশু চুক্তি করিতে পারে না। তা হলে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো মালিক বা ব্যবস্থাপক কোনো শিশুকে নিয়োগ দিতে পারে না।

শিশু শ্রমিক নিয়োগের শাস্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এর ধারা ২৮৪-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে চাকুরিতে নিযুক্ত করিলে, অথবা এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন শিশুকে চাকুরি করিবার অনুমতি দিলে, তিনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। এই আইনের ধারা ২৮৫-তে উল্লেখ করা হয়েছে যেকোন শিশুর পিতা-মাতা বা অভিভাবক ধারা ৩৫-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন শিশু সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন করিলে, তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

শিশু শ্রমের বৈশ্বিক অবস্থা

পৃথিবীর সব দেশে কমবেশি নানারকমের শিশুশ্রম বিদ্যমান আছে। উন্নত দেশসমূহে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা খুবই নগন্য। তবে, তৃতীয় বিশ্বে এই সংখ্যা অনেক বেশি। দারিদ্র্য শিশুশ্রমের মূল কারণ। বর্তমান বিশ্বে ২০ কোটি শিশুশ্রমিক কাজ করে (অগাস্ট,২০০০)। আফ্রিকায় ৭ কোটি ১০ লক্ষ, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ১২ কোটি ২০ লক্ষ , দক্ষিণ আমেরিকায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ (২০১৮), যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লক্ষ কৃষি শিশুশ্রমিক কাজ করে এবং অন্য কাজে প্রায় ১ কোটি শিশু কোনো না কোনো প্রকার অকৃষি কাজে নিয়োজিত থাকে। কানাডায় ১ কোটি ৫২ লক্ষ শিশু কোনো না কোনো প্রকারের শিশুশ্রমে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশে ৪৭ লক্ষ শিশুশ্রমিক কাজ করে; যার মধ্যে ৩৪ লক্ষ ছেলে শিশু শ্রমিক; আর ১৩ লক্ষ মেয়ে শিশুশ্রমিক (২০১৯)। ভারতে ১ কোটি ৫২ লক্ষ শিশুশ্রমিক কাজ করে (জুন, ২০২০) এবং পাকিস্তানে ১ কোটি ২০ লক্ষ শিশুশ্রমিক কাজ করে (অগাস্ট, ২০২০)।

সারসংক্ষেপ

শিল্প-সম্পর্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে মানবাধিকার ও শিশুশ্রম। প্রকৃতপক্ষে শিশুশ্রম মানবাধিকারের লঙ্ঘন। শিশুশ্রম এমন সব কাজ যা শিশুদের জন্য মানসিক, দৈহিক, সামাজিক বা নৈতিক বিচারে মারাত্মক ও ক্ষতিকর এবং যা শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে। বাংলাদেশের সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার ঘোষণার ৩০টি ধারা আছে, যা পৃথিবীর ১৯৩টি দেশ কমবেশী ধারা অনুসমর্থন করেছে। আইন অনুসারে ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি এমন সকল ব্যক্তি হচ্ছে শিশু। শিশুশ্রম সকল দেশে নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর সব দেশে কমবেশি শিশুশ্রম আছে। উন্নয়নশীল দেশে বেশি শিশুশ্রমিক আছে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। শিল্প-সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ কী ব্যাখ্যা করুন।
২। শিল্প-সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ কী কী তার নাম বলুন।
৩। শিল্প-সম্পর্কের স্বচ্ছতা ও সমতা ধারণা ও মূল্যবোধটি ব্যাখ্যা করুন।
৪। শিল্প-সম্পর্কের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ধারণা ও মূল্যবোধটি ব্যাখ্যা করুন।
৫। শিল্প-সম্পর্কের স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংঘবাদ ধারণা ও মূল্যবোধটি ব্যাখ্যা করুন।
৬। শিল্প-সম্পর্কের অধিকার ও দায়িত্ব ধারণা ও মূল্যবোধটি ব্যাখ্যা করুন।
৭। শিল্প-সম্পর্কের সততা ও আস্থা ধারণা ও মূল্যবোধটি ব্যাখ্যা করুন।
৮। অধিকার বলতে কী বোঝায় তা বলুন।
৯। মানবাধিকার বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করুন।
১০। মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করুন।
১১। বাংলাদেশে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন।
১২। সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা দিন।
১৩। শিশুশ্রম বলতে কী বোঝায় তা বুঝিয়ে বলুন।
১৪। শিশু কে?
১৫। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ কি না তা ব্যাখ্যা করুন।
১৬। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে শিশুশ্রমের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।